হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ র.

জীবন ও কর্ম

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

CamScanner

প্রথম অধ্যায়

জন্ম

হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ র. ১৯১০ সালে খুলনা জেলার তেরখাদা থানার বামনডাংগা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মুছাহেবুদ্দীন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা খুলনার নিকটবর্তী চরেরহাট এলাকায় বসবাস করতেন। সেখান থেকে তারা বামনডাংগা গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। চরেরহাট এলাকায় বিশেষ করে চাষাবাদের জমির স্বল্পতার কারণেই তারা বসতি পরিবর্তন করেন। বামনডাংগা গ্রামে গিয়ে তারা প্রচুর পরিমাণে জমিজমা খরিদ করেন। নড়াইলের জমিদারের অধীনে তারা গাতিদার ছিলেন। গাতি বাবদ তাদের প্রচুর অর্থ আয় হত। নিজেদের জমিজমা তারা কিছু নিজেরা চাষ করতেন আর কিছু বর্গা দিতেন। এভাবে তারা সংসার চালাতেন। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। লোকবলও ছিল প্রচুর। বসতবাড়ি ছিল বিশাল এলাকা নিয়ে।

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ র. সর্বপ্রথম নিজ গ্রামেই লেখাপড়া শুরু করেন। মুনশী গুল মোহাম্মাদ নামে একজন প্রবীণ বুযুর্গ তাদের গ্রামে থাকতেন। তাঁর নিকটেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। অতঃপর বামনডাংগা থেকে ৩/৪ মাইল দূরে নড়াইলের হাজীগ্রামে মাওলানা হাতেম আহমদ নামক একজন প্রবীণ ও বুযুর্গ আলেম ছিলেন। তাঁর নিকট লেখাপড়া করার জন্য তিনি হাজীগ্রামে যান এবং লেখাপড়া করেন। তারপর মাওলানা হাতেম আহমদ সাহেবের অনুপ্রেরণায় ও পরামর্শক্রমে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি মেটিয়া বুরজ এলাকায় অবস্থিত আখড়া আলিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক কোন শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ মাদরাসায় তিনি আলিম পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। আলিম পাশ করার পর কলকাতা আলিয়া ও আখড়া মাদরাসার মাঝামাঝি বটতলা মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি জামাআতে উলা পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় টাইটেল ক্লাসে ভর্তি হন। বটতলা থেকে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রায় তিন মাইল। তিনি বটতলায় লজিং থাকতেন এবং প্রতিদিন এ তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসা যাওয়া করতেন। এভাবে অনেক কষ্ট করে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাশ করেন।

দেশে ফেরার পর তিনি গ্রামের লোকদের সমবেত করলেন এবং তাদের নিকট তিনি নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও পরামর্শ চান। গ্রামটি ছিল অনেক বড়। সেমতে অনেক মুরব্বী ও মাতব্বর উক্ত বৈঠকে হাজির হন। তিনি বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু ইল্‌মে দীন হাসিল করার তৌফিক দান করেছেন আমার মনের একান্ত ইচ্ছা, আমার এলাকার ছেলেমেয়েরা তা দ্বারা উপকার লাভ করুক। আপনারা এ ব্যাপারে আমাকে কী পরামর্শ দেন, আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই।

গ্রামের মুরব্বীরা বললেন, আমরা আপনার একথা শুনে খুবই অনুপ্রাণিত হলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আমাদের এলাকার লোকজনের মনোভাব হলো, তারা শিক্ষা লাভ করতে চায় ঠিকই। কিন্তু এজন্য আপনাকে কোন ভাতা বা সম্মানী দেওয়া সম্ভব হবে না। এরপরেও যদি আপনি আমাদের এ খেদমত করতে চান, তাহলে আমরা যতদূর সম্ভব আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আপনার খেদমত করব। এতে কোন ত্রুটি হবে না। আমাদের এই কাছারী ঘরেই আপনি শিক্ষাদানের কাজ শুরু করতে পারেন। আপনার সার্বিক সাহায্য আমরা করব।

সেমতে তিনি নিজেদের বাড়ির বিশাল এক কাছারী ঘরে এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। প্রায় দেড়শত ছেলেমেয়েকে তিনি বাগদাদী কায়েদা, আমপারা ও কুরআন শরীফ পড়ানো শুরু করেন। এভাবে তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেন। এরপর তিনি তাদেরকে কিছু বাংলা শিখানোরও ব্যবস্থা করলেন। তখন সেই প্রবীণ শিক্ষক মুনশী গুল মোহাম্মাদ বললেন, বাবা, আমার বয়স হয়েছে। তুমি যখন পড়ানো শুরু করেছ তখন আমি এবার নিজ এলাকায় চলে যাই। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট এলাকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, তিনি যখন নিজ বাড়ির কাছারী ঘরে শিক্ষাদান করতেন, তখন তার ছাত্রদের মধ্যে তার ভাগিনা শায়খুল হাদীস মাওলানা শওকত সাহেবও

ছিলেন। গ্রামের আরো কয়েকজন বালকও ছিল। তিনি তাদেরকে সেই মকতবেই এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, সেখান থেকে তারা ঢাকায়, কলকাতায় ও দেওবন্দ সাহারানপুরে গিয়ে উচ্চতর দীনী শিক্ষা লাভ করে।

দু'তিন বছর এ মকতব চালু থাকে। অতঃপর উদয়পুরের পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেব একবার বামনডাংগা গ্রামে আসেন। তিনি মাঝে মধ্যে এরূপ আসতেন। কারণ উক্ত এলাকায় তাঁর অনেক মুরীদ ছিলেন। সে বছর ভাদ্র মাসে তার কয়েকজন মুরীদসহ তিনি বারাসাত গ্রামে আসেন। বারাসাতের একজন হাজী সাহেব, যিনি হাজী আবদুস সামাদ মুছল্লী নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি পীর সাহেবকে বললেন, হুজুর, আমাদের এলাকায় একজন বড় আলেম আছেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাশ করে এসেছেন। যদি তাঁর সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি খুশি হবেন।

পীর সাহেব বললেন, আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। সেমতে তাঁকে তাঁর বাওয়ালে করে মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের বাড়িতে আনা হয়। পীর সাহেব এসে দেখলেন কাছারী ঘরে প্রচুর সংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। পীর সাহেব খুবই সন্তুষ্ট হলেন। মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব ঘাটে গিয়ে পীর সাহেবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন। পীর সাহেবকে যথাযথ আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা করা হল।

তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের সাথে কথাবার্তা বললেন। তিনি তাঁর কথাবার্তা ও আচরণে মুগ্ধ হলেন। দৈহিক সৌন্দর্যেরও অধিকারী ছিলেন মাওলানা আব্দুল আজিজ। এক পর্যায়ে পীর সাহেব বললেন, বাবা! আপনার মত আলেমের পক্ষে গ্রামের ছোট মকতব নিয়ে বসে থাকা শোভা পায় না। আপনার ইলমী যোগ্যতার নিকট আরো অনেক বেশি খেদমত কাম্য। আপনি আমার উদয়পুর মাদরাসায় চলুন। সেখানে মুদাররিসী করবেন।

কিছুদিন পরে তিনি উদয়পুর মাদরাসা দেখলেন। পীর সাহেবের সাথে সব কিছু চূড়ান্ত করলেন। অতঃপর তিনি উদয়পুর মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। গ্রামের লোকদেরকে পীর সাহেব বুঝিয়ে গেলেন যে, মকতবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন সাধারণ আরবী জানা লোকই যথেষ্ট। মাওলানা আব্দুল আজিজের মত একজন উচ্চ শিক্ষিত আলেমকে এখানে আটকে রাখা ঠিক হবে না। তার দ্বারা অনেক উচুঁ স্তরের খেদমত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

গ্রামের লোকেরা আর কোন আপত্তি করল না। সেমতে তিনি উদয়পুর মাদরাসায় গিয়ে জালালাইন শরীফসহ বিভিন্ন কিতাবের দরস দেওয়া শুরু করেন। বছরখানেক পর পীর সাহেব তাঁর নিজের মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দেন।

এক বছর পর পীর সাহেব হুজুরের উক্ত মেয়ে সন্তান প্রসবের সময় ইন্তেকাল করেন। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। পরের বছর পীর সাহেব হজ্জে যাওয়ার সময় জামাতাকে সাথে করে নিয়ে যান। কারণ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে একাকী সফরে যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। আল্লাহর কী মহিমা! পীর সাহেব উক্ত সফরেই মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মক্কার প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল মুআল্লায় তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তার রওযা সর্বদা নূরের আলোকে ভরপুর রাখুন ও তার মর্যাদা বুলন্দ করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব র.

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী র. নিজামুদ্দীনে গিয়ে হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস র. এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদরের সঙ্গে বলেছিলেন; তোমাকে বাংলাদেশে তাবলীগের দায়িত্ব নিতে হবে। মাওলানা ফরিদপুরী লাব্বাইক বলে দেশে ফিরে খুলনার মোল্লাহাট থানার উদয়পুরের পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেবের মাদরাসা দেখতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর নজর পড়ে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের উপর। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি এখানে কী কর? মাওলানা বলেন, হুজুর আমি এখানকার শিক্ষক, পীর সাহেবের জামাতা।

হযরত সদর সাহেব র. পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে মাওলানা আব্দুল আজিজকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। মাওলানা ফরিদপুরী তখন কলকাতায় রায়বেগু এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই থাকতেন। তিনি মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে তার মাদরাসায় থাকার জন্য আহ্বান জানান। সেই মাদরাসায় থাকার সময়ই হযরত মাওলানা র. তাঁর শ্বশুর সাহেব উদয়পুরের পীর সাহেবের সাথে পরামর্শ করে কলকাতা রওয়ানা হন এবং শামছুল হক ফরিদপুরীর মাদরাসায় পড়ানোর কাজ শুরু করেন। সেই মাদরাসায় থাকতেই কলকাতায় তাবলীগের একটি জামাআত আসে দিল্লী থেকে। তাতে দিল্লী, মেওয়াত ও ইউপির বেশ কয়েকজন আলেম ছিলেন। উক্ত জামাআতের সাথে মাওলানা ফরিদপুরী ও মাওলানা আব্দুল আজিজ উভয়েই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় কাজ করেন। এতে করে মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের মনে তাবলীগের প্রতি বেশ আগ্রহ জন্মে। তিনি হযরত ফরিদপুরীর সাথে পরামর্শক্রমে তাবলীগের কাজ ভালভাবে জানা ও বুঝার জন্য এক চিল্লায় রওয়ানা হয়ে যান।

দিল্লীতে পৌঁছে তিনি এক চিল্লার পরে আরো সময় ব্যয় করেন তাবলীগের কাজে। ফিরে এসে তিনি মাওলানা ফরিদপুরী র. এর সাথে আলোচনা করেন যে, তাবলীগের কাজ খুবই মহান। মানুষের ইহ ও পরকালীন উন্নতি ও মুক্তি এ কাজের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সুতরাং

তিনি তাবলীগের কাজে আরো সময় ব্যয় করতে চাইলেন। মাওলানা ফরিদপুরী র. বললেন, এ কাজ আমারও খুবই প্রিয়। তাই তুমি যদি এতে আরো সময় দিতে চাও, তাহলে দাও। সে মতে তিনি আবার তাবলীগে চলে গেলেন। এরপর তিনি আর কোন মাদরাসায় সম্পৃক্ত হননি। তাবলীগেই লেগে থাকেন এবং সারা জীবন তাবলীগী জামাআতের সাথে কাজ করতে করতেই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন।

দিল্লী থেকে ফিরে এসে তিনি কলকাতায়ই তাবলীগের কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর কলকাতা থেকে দেশে ফিরে তিনি মোল্লাহাটের উদয়পুরে তাবলীগের একটি ইজতেমার আয়োজন করেন। নদীর তীরে অনুষ্ঠিত এই ইজতেমায় দিল্লী ও কলকাতার অনেক তাবলীগী মুরব্বী অংশগ্রহণ করেন। লোক সমাগম খুব বেশি না হলেও এ ইজতেমা হয়েছিল অত্যন্ত সুন্দররূপে। তিন চিল্লা শেষে নিজামুদ্দীন হতে ফিরে এসে উদয়পুর মাদরাসা মসজিদকে মারকায ঠিক করে কাজ শুরু করেন। শুরু হয় বাংলার জমিনে দাওয়াতী কাজ। সদর সাহেব র. অন্যদের সাথে পরামর্শ করে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে আমীর মনোনীত করেন। ২/৩ বছর কাজ চলার পর এক সঙ্গে মাদরাসা ও তাবলীগের কাজে কিছু অসুবিধা হওয়ায় হযরত সদর সাহেব মারকাযকে মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের গ্রামের বাজার মসজিদ তেরখাদা থানার বামনডাংগায় স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। এটা হলো বাংলাদেশে দ্বিতীয় মারকায। এখানে ৪/৫ বছর পূর্ণোদ্যমে কাজ চলে, কাজের উন্নতি হয়।

একবার ইজতেমার সময় মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ! গ্রামে মারকায হয় না। মারকায খুলনায় নেয়া দরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হল। হেলাতলার মোতাওয়াল্লী সাহেবের কাছে বলে তালাবওয়ালী মসজিদ বর্তমান দারুল উলূম মাদরাসার মসজিদে মারকায স্থানান্তরিত করা হয়। কাজ জোরেশোরে আরম্ভ হলো, বরকত হলো। হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব সর্বদা মারকাযে অবস্থান করতে থাকেন।

একবার ইজতেমার পর পরামর্শ হলো, হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ! দেহ এক জায়গায় আর রূহ অন্য জায়গায়। কাজে বরকত হচ্ছে না। এখানে মারকায চলুক এলাকার ভিত্তিতে। তুমি ঢাকার লালবাগে শাহী মসজিদে চলে আস। কিন্তু শাহী মসজিদে জায়গার সংকুলান হয় না। হুজুর বললেন, দেখ মসজিদের সাথে মাঠ কোথায় আছে? পরামর্শ করে কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকের খান মুহাম্মাদ

মসজিদকে মারকায করে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সেখানে আসলেন। এটা হলো বাংলাদেশের পঞ্চম মারকায, লালবাগ চতুর্থ, খুলনা তৃতীয়, বামনডাংগা দ্বিতীয় এবং উদয়পুর প্রথম মারকায।

কয়েক বছর পরে খান মুহাম্মাদ মসজিদ মাঠেও ইজতেমার জায়গা সংকুলান হলো না। পরামর্শ হলো। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব সবাইকে বললেন, আপনারা দেখুন ঢাকা শহরে বড় মাঠের পাশে কোথাও মসজিদ আছে কি না। অনেক অনুসন্ধানের পর পাওয়া গেল রমনা পার্ক বড় ময়দানের পাশে ছোট একটি মসজিদ আছে, নাম মালওয়ালী মসজিদ। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব বললেন, ছোট মসজিদ হোক ক্ষতি নেই, পার্কের জায়গা কিছুটা বরাদ্দ নিয়ে আমরা মসজিদ বড় করে নেব ইন্‌শাআল্লাহ।

মালওয়ালী মসজিদে মারকায কায়েম হলো, ছয় নম্বরী দাওয়াতের কাজের ষষ্ঠ মারকায হলো। হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব খুশি হলেন। এভাবে বাংলাদেশে তাবলীগ জামাআতের মারকায হয়।

কাকরাইল মারকায : কিছু ইতিহাস

কাকরাইলে আগে থেকেই একটি মসজিদ ছিল। তবে ছোট একটি জীর্ণশীর্ণ মসজিদ ছিল। এটা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার মসজিদ। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল সেটি। অনেক পুরু দেয়াল ছিল। তার নির্দশন স্বরূপ এখনো ছোট একটি গেইট আছে। এ মসজিদটি তত্ত্বাবধান করতেন একাউন্টেন্ড জেনারেল জমিরউদ্দিন সাহেব। বর্তমানে মসজিদে ঢুকতে প্রথমে যে কামরা দেখা যায় এটা তৎকালীন সরকারী বাড়ির অংশ বিশেষ।

কাকরাইল মসজিদে মারকায প্রতিষ্ঠার প্রায় দু'তিন বছর পূর্ব থেকে সেখানে তাবলীগের জামাআত আসা যাওয়া করতো অর্থাৎ তাবলীগের কাজ শুরু হয়েছিল। এটি খুব সম্ভব পঞ্চাশের দশকের শুরুতে।

তখন প্রতি বৃহস্পতিবার ইজতেমা হতো। এ ছিল শুধু ঢাকা শহরের জন্য। আর আশপাশের এলাকা যেমন নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ইত্যাদি এলাকার জন্য মাসে একবার ইজতেমা হতো। এভাবে অনেকদিন চলেছে। সে সময় বড় হুজুরের সাথীদের মধ্যে ছিলেন হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব, হাজী আব্দুল মুকীত সাহেবের বড় ভাই দাদা সাহেব। মাওলানা মুনীর সাহেব তখন সবেমাত্র তাবলীগের কাজে যোগ দিয়েছেন। আরো ছিলেন মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব। মাওলানা আকবর আলী সাহেব, মাওলানা জসিমুদ্দীন সাহেব, মাওলানা আবুল ফাতাহ সাহেব।

বইপত্রের অনুবাদ সর্বপ্রথম করেন আকবর আলী সাহেব। পরে মাওলানা সাখাওয়াতুল্লাহ সাহেব।

মাওলানা কাসিমুদ্দীন সাহেব ছিলেন সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজ মসজিদের ইমাম। তার কেরাত ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি ঢাকায় এলে আকবর আলী সাহেব নামায পড়াতেন না। কাসিমুদ্দীন সাহেবই পড়াতেন। মোটকথা, এখান থেকেই কাজ শুরু হয়। তারপর বাইরের সফরও হয়।

প্রথম দিকে তাবলীগের কাজ চালু করতে বেশ কষ্ট হয়েছে। কেননা এখনতো তাবলীগের কাজের সমাদর আছে কিন্তু তখন এ কাজের তেমন সমাদর ছিল না। সে জন্য প্রথমদিকে জামাআত পাঠানোর সময় হেদায়েত দিয়ে দেওয়া হতো যে, প্রথমে 'তাবলীগ কি' তা বুঝাতে হবে। তখন তাবলীগের জামাআতকে দাওয়াত করে খাওয়াবে এমন কল্পনাও করা যেতো না।

কাকরাইলের বর্তমান মসজিদটি হয়েছে ১৯৬৪ সালে। বর্তমান মসজিদের মাঝখানের পিলার থেকে পূর্বদিকের অংশটিই পুরাতন মসজিদ। পরে অবশিষ্ট অংশ বাড়ানো হয়েছে।

এ মসজিদ উদ্বোধন করেন হযরতজী মাওলানা ইউসুফ র. ১৯৬৪ সালে। এটাই পূর্ব বাংলায় তার শেষ সফর।

প্রথমে ইজতেমা কাকরাইল মসজিদের পাশে রমনা পার্কে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার নারায়ণগঞ্জের উত্তর পার্শ্বে মাঠে হয়েছে। অবশ্য সে দুই ইজতেমা বিশ্ব ইজতেমা নয়।

রমনার পরে ইজতেমা চলে যায় টঙ্গীতে ১৯৬৭ সালে। টঙ্গী ব্রীজের পূর্বদিকে দুইবার ইজতেমা হয়েছে। এরপর থেকে বর্তমান স্থানে।

CS CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

আধ্যাত্মিকতায় মাওলানা আব্দুল আজিজ র.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে রূহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের শরীরে যেমন রোগ আছে এবং মানুষ রোগে আক্রান্ত হলে যেমন শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন বিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা না করালে যেমন মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ আত্মার রোগে আক্রান্ত রোগীও আত্মার বিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক চিকিৎসা না করালে রূহের অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার রোগকে, শরীরের রোগকে কতই না ভয় করে। শরীরের রোগ দূর করার জন্য সাধারণ ডাক্তার, কবিরাজ, হাকীম সবার নিকট ধর্না দেয়ার পর সুস্থ না হলে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দেশে বিদেশে বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছেও ধর্না দেয়। কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, কাম, ক্রোধ, গীবত, অহংকার নামক আত্মিক রোগের আক্রমণ মানুষ বুঝতেও পারে না। আত্মার কোন ব্যাধি হতে পারে এ সম্পর্কে অনেকে কোন ধারণাও রাখে না। অথচ দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মাই মানুষের আসল অংশ।

দেহের ব্যাধি দূর করা যেমন জরুরী, তার চেয়ে বেশি জরুরী আত্মার ব্যাধি দূর করা। দেহের ব্যাধি দূর না করলে হয়তো ব্যক্তি মরে যেতে পারে এবং ঈমান থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু আত্মার ব্যাধি দূর না করে দুনিয়া থেকে চলে গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। উভয়বিধ ব্যাধির চিকিৎসা করে আত্মার গুণসমূহ অর্জন করে একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার নামই হলো তাযকিয়া বা ইসলাহে নফস।

ইসলাহে নফসের দায়িত্ব পালন করে থাকেন বিজ্ঞ রূহানী ডাক্তার বা হাকীমগণ। দুনিয়াবী রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তাকে যেমন কেউ অস্বীকার করে না তদ্রূপ রূহানী চিকিৎসার প্রয়োজনকে আরো বেশি জরুরী মনে করার প্রয়োজন রয়েছে। দেহের ডাক্তাররা অবশ্য সাইনবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের প্রদর্শন করলেও আত্মার ডাক্তাররা নিজেদের প্রকাশ করতে চান না। তাই তারা লুকায়িত থাকেন। তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। আল্লাহ ওয়ালারা শায়খে কামেল বা আত্মার রূহানী ডাক্তারগণকে খুঁজে বের করে তার সোহবতে কিছুদিন অবস্থান করে বা

যোগাযোগ রেখে নিজের নফসের ইসলাহ করার চেষ্টা করেন। ইসলাহে নফসের উদ্দেশ্য হল তামীরুজ্জাহের ওয়াল বাতেন অর্থাৎ নিজের জাহের ও বাতেনের রোগগুলি দূর করে নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। এই গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় একজন বিজ্ঞ মুরব্বীর, শায়খে কামেলের।

দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে জড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাহে নফসের ব্যাপারে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এ কাজটা যে খুবই জরুরি তা তারা জানেনও না। ফলে তারা ইসলাহে নফসের জন্য কোন শায়খ তালাশ করার জরুরতও অনুভব করেন না। অথচ বর্তমান তাবলীগ জামাআতের যিনি আসল মুরব্বী হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস র. ছাত্র জীবনেই হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহীর হাতে বায়আত হয়েছিলেন। হযরত গঙ্গুহীর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান র. এর হাতে বায়আত হওয়ার আশা পোষণ করলে হযরত শায়খুল হিন্দ তাঁকে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর দিকে রুজু হতে পরামর্শ দেন। ফলে তিনি হযরত মাওলানা সাহারানপুরীর নিকট পুনঃ বায়আত হন এবং তারই তত্ত্বাবধানে রূহানী জগতের উচ্চ মাকামে আরোহণ করতে থাকেন। সমসাময়িক বুযুর্গদের মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং অন্যান্য আহলুল্লাহর সাথেও তিনি গভীর সম্পর্ক রাখতেন।

জীবনের শেষের দিকে তিনি মাঝে মাঝে কোন ইজতেমা থেকে আসার পর কয়েক দিন হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরীর খানকায় অবস্থান করতেন। এমনি করে দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ও তৃতীয় হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ এনামুল হাসান সাহেব র.সহ তাবলীগের প্রায় সকল মুরব্বীই কোন না কোন শায়খে কামেলের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। এ সিলাসিলা হতে আমাদের বাংলাদেশ তাবলীগে জামাআতের আমীর মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবও আলাদা ছিলেন না। তিনিও বরাবর একজন শায়খে কামেলের হাতে বায়আত হয়ে তাবলীগের কাজে নিমগ্ন ছিলেন।

হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব র. ছোটকাল থেকেই নিজের জাহের ও বাতেনের ইসলাহের ফিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভবিষ্যতে যার দ্বারা উম্মতের এক বিরাট অংশের ইসলাহের খেদমত নিবেন, তাকে ছোটকাল হতে সেভাবেই গড়ে তোলেন। জীবন

গড়ার উপকরণও আল্লাহ পাক তাকে জুটিয়ে দেন। ছাত্রজীবন শেষে প্রথম যে পীরের পরশে ধন্য হয়েছিলেন তিনি হলেন উদয়পুরের পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম র.। হযরত পীর সাহেবের তত্ত্বাবধানে তিনি স্বীয় জীবনের সকল কার্যক্রম চালাতে থাকেন। পীর সাহেব র. তার এ খাদেমকে মনের মত করে গড়ে তোলেন। তিনিও পীর সাহেবকে নিজের রূহানী পিতা মনে করে জানে প্রাণে খেদমত করতেন। বিশেষ করে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত নিয়ে যখন তিনি উদয়পুরে হাজিরা দেন তখন পীর সাহেব র. যারপরনাই খুশি হন এবং তার জন্য প্রাণ খুলে দুআ করেন।

পরবর্তীতে পীর সাহেবের শেষ হজ্জের সফরে পীর সাহেব নিজেই মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে সাথে নেন। এ নিরিবিলি সফরে তিনি তার পীরের রূহানী ফুয়ূযাত থেকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। তিনি এ সফরে পীর সাহেবের বিশেষ নেক দৃষ্টি এবং দুআ লাভে ধন্য হন। ঐ সময় অসুস্থ ও বৃদ্ধ পীর সাহেবের তিনি নিজের ছেলের চাইতেও বেশি খেদমত করেন। পীর সাহেবের মক্কা শরীফে ইন্তেকালের পূর্বে তিনি হযরত মাওলানাকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, বাবা আব্দুল আজিজ! তুমি আমার যে খেদমত করলে তা আমার সন্তানরাও করতে পারতো না। আমি তোমার উপর খুবই খুশি হয়েছি। আল্লাহ পাক তোমার দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগের খেদমত নিন এই দুআ করি। মাওলানা আব্দুল আজিজ নিজ পীর সাহেবের খেদমতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তবে তিনি তার এই পীর সাহেবের কাছ হতে খেলাফত পেয়েছিলেন কি না তা জানা যায়নি।

এরপর হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ র. তাবলীগ জামাআতের দ্বিতীয় আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব র. এর নিকট বায়আত হন এবং আধ্যাত্মিক সাধনা জারী রাখেন। হযরতজীর সোহবতে বারবার যাতায়াতের মাধ্যমে তিনি রূহানী তরক্কী করতে থাকেন। তাবলীগী সিলসিলায় বারবার মারকায নিজামুদ্দীনে যাওয়া-আসা বা হযরতজী ইজতেমা বা অন্য সময় এদেশের সফরে আসলে হযরত মাওলানা দিনরাত হযরতের সাথে থেকে হযরতজী র. থেকে দাওয়াতী এবং ইসলাহী নেয়ামত হাসেল করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে হযরতজীর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্ক কায়েম রাখেন।

এরপর তিনি হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করেন। হযরত শায়খ তখন এ উপমহাদেশের বড় আলেম এবং শায়খে তরীকত বলে বিবেচিত হতেন। তিনি নিজামুদ্দীনের তাবলীগী মারকাযে যাতায়াতের সময় মাদরাসা মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরে

হযরত শায়খের মজলিসে যাতায়াত শুরু করেন। ধীরে ধীরে এ সম্পর্ক বাড়তে থাকে। হযরত শায়খ তাঁর এ মুরীদের দিকে খাস দৃষ্টি দান করেন। মাঝে মাঝে রমযান মাসে তিনি হযরত শায়খুল হাদীস র. এর ই'তিকাফের মজলিসে অবস্থান করে বরকত হাসিল করতেন। অবশেষে হযরত শায়খ হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে খেলাফত দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি তাঁর এ মুরীদের প্রতি খুবই আস্থাবান ছিলেন।

হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব র. ছিলেন তরীকত ও ইলমে মারেফাতের একজন ওলীয়ে কামেল। তার অনেক আশেক ভক্ত ও মুরীদ ছিল। প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষ তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতো। শেষরাতে তাহাজ্জুদের পর তিনি আগ্রহী প্রার্থীদেরকে মুরীদ করতেন। তিনি প্রত্যহ ফজর বাদ আপন শায়খের বাতানো ওজিফা আদায় করতেন। তার আশেকানা জিকির শুনে কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হতো।

আহলুল্লাহর সোহবতে হাজির হওয়ার জযবা

হযরত মাওলানা র. হাক্কানী বুযুর্গানে দীনের সোহবত হতে ফায়দা নিতে সর্বদা আগ্রহী থাকতেন। একবার করাচীর আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাকীম শাহ মুহাম্মাদ আখতার সাহেব দা. বা. খুলনা সফরে এসে সুন্দরবন দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর সফরের সকল ব্যবস্থা করা হলে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবও তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। করাচীর হযরতের অনুমতি পেয়ে তিনি খুবই খুশি হন।

এ সফরে তিনি করাচীর হযরতকে খুবই সম্মান ও তাযীম করেন। সফরে তিনি কোন কথাই বলতেন না। বরং করাচীর হযরতের ওয়াজ-নসীহত খুবই মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলেন। সফর শেষে খুলনা দারুল উলূম মাদরাসায় একটি ইসলাহী মজলিসের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বড় হুজুর করাচীর হযরতের পাশে একটি চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনেন।

একজন খাঁটি মুবাল্লিগে দীনের উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ র.। তাঁর মতো উদার মনের মুবাল্লিগ ও হাক্কানী বুযুর্গ আলেম আজ সত্যই বিরল।

সুন্নতের পাবন্দী

বড় হুজুরের চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সুন্নাতের খুবই পাবন্দী করতেন। নামায জামাআতের সাথে আদায় করা, তাকবীরে উলা পাওয়া, ইমামের পিছনে দাঁড়ানো -এসব বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন।

নামাযে সুন্নাত কেরাত তিনি নিজে যেমন পড়তেন তেমনি অন্য কেউ নামায পড়ালে তাকেও উৎসাহিত করতেন। কোন ইমাম সাহেব সুন্নাত কেরাত না পড়লে তিনি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং সুন্নত কেরাত না পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করতেন। বড় বড় আলেমদেরও তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

নফল নামাযের এহতেমাম

হযরত মাওলানা র. নফল নামাযের এহতেমাম করতেন। তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন এসব নামাযের তিনি খুবই পাবন্দী করতেন। সফরে বা নিজ এলাকায় যেখানে যে অবস্থায় তিনি থাকতেন সেখানেই এ আমলগুলো নিয়মিত করতেন। তাঁর তাহাজ্জুদ কোন সময় কাজা হতো না।